ভিক্ষুক ব্যবসার নেটওয়ার্ক বছরে আয় ৩০ কোটি

খন্দকার তাজউদ্দিন উল্লাস

আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরের চারদিকে তাকালেই দেখা যায়, ঠিকানাবিহীন ভাসমান ভিক্ষুকদের ভিড়। এসব মানুষ এ সমাজেরই বাসিন্দা। সারা শহর জুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে গেছে ভিক্ষুকদের সংখ্যা। রাজধানী হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে ঢাকা সত্যিই ব্যতিক্রম। আকাশচুম্বী অট্টালিকা আর পাঁচতারা হোটেলের পাশেই ঠিকানাবিহীন ভাসমান মানুষের আশ্রয়স্থল বস্তিঘর। রাজধানীর ভিক্ষুকরা এই বস্তি ঘরেরই বাসিন্দা। এই ভিক্ষুকদের ঘিরে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করছে পেশাদার ভিক্ষুক 'গডফাদাররা'। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থেকে তারাই পরিচালনা করছে রাজধানীর ভিক্ষাভিত্তিক পেশাকে। ভিক্ষুক গডফাদাররা সারা দেশ থেকে ভিক্ষুক সংগ্রহ করে তাদের ভিক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে। এই ভিক্ষুকদের বিভিন্ন মৌসুমে স্থান পরিবর্তন করানো হয়। ভিক্ষুকদের গডফাদারদের নেটওয়ার্ক রয়েছে রাজধানীর বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে। বিশেষ করে রমজান মাসে ঘাট এলাকা থেকে রাজধানীতে ভিক্ষুকদের ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। আবার দুই ঈদের আগের দিন রাজধানী থেকে ভিক্ষুকদের ভাড়া করে ঘাট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

শহরের প্রত্যেক থানায় রয়েছে ভিক্ষুকদের আলাদা আলাদা সংঘবদ্ধ গ্রুপ। দিনের বিভিন্ন সময়ে ক্যাব, সিএনজি, অটোরিকশা, রিকশা এবং ট্রলিতে করে ভিক্ষুকদের বিভিন্ন স্পটে নামিয়ে দেয়া হয়। তারপর দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় কার্যক্রম। স্থানভেদে এদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। স্পটের গুরুত্ব এবং ভিক্ষুকের দক্ষতা এখানে বিশেষভাবে কাজ করে। তবে সাধারণভাবে ১০০ টাকায় ৫০ টাকা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪০ টাকা বা ৪৫ টাকা ভিক্ষুকরা পেয়ে থাকে, বাকি টাকা পায় ভিক্ষুকদের গডফাদার এবং বিভিন্ন স্পটের পুলিশ। ভিক্ষুকদের এই নেটওয়ার্ক সাধারণত যে স্থানগুলো বেছে নিয়ে ভিক্ষা করে তা হলো : ঢাকা শহরের বিভিন্ন ফুটপাত, ব্যস্ততম শপিং সেন্টারের সম্মুখদ্বার, সকল ওভারব্রিজ, সিনেমা হলের সম্মুখদ্বার, সকল বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, রেলস্টেশন, ট্রাক স্ট্যান্ড, ফাইভ স্টার হোটেল সংলগ্ন এলাকা, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থল ও মোড়, রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রবেশদ্বার, নগরীর সব বিনোদন পার্ক এবং বিভিন্ন ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানের সামনের রাস্তা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজধানীতে এক পা কাটা, হাত কাটা, হাতের পাঁচ আঙুল কাটা, দু'চোখ কানা, জন্মান্ধ, জন্মসূত্রে অঙ্গহানি, সারা গায়ে বিচিত্র গোটা, বিকট হাত-পা, হাত-পা শুকনা, প্যারালাইসিস রোগী, এক বা দেড় মাস বয়সী বাচ্চা, বিকলাঙ্গ শরীর, চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দুই পা ভাঙা, বোবা, ক্ষুদ্র হাত-পা'ওয়ালা ছিন্নমূল মানুষ ট্রলিতে চেপে ভিক্ষা করছে।

ওরা যা বললো

আমরা এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলি। তাদের একজন করিমন বিবি। বয়স ৭০ পেরিয়ে গেছে। ভিক্ষা করে ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হল সংলগ্ন ওভারব্রিজের ওপর। দেখলে মনে হয়, আজই যেন প্রাণ ত্যাগ করবে। জানতে চাইলাম নাম-ঠিকানা। তার জিজ্ঞাসু চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছু সময়। উল্টো প্রশ্ন করে, কি দরকার এ সবের? ভিক্ষার অঙ্কটা বাড়িয়ে দিতে বেরিয়ে গেল তার পরিচয়। করিমন বিবির বাড়ি কুমিল্লার দেবীদ্বার থানার নিভৃত গ্রামে। স্বামীর সংসার ছেড়ে এসেছেন চল্লিশের আগে। স্বামী

আরো একাধিক বিয়ে করায় এক সময় বাড়ি থেকে বের করে দেয়। অসহায় দুই সন্তান নিয়ে চলে আসে ঢাকায়। বাসা-বাড়িতে বুয়া হিসেবে কাজ নেয়। ছেলেরা ঢাকায় রিকশা চালায়, তার খোঁজ কেউ রাখে না। এখন সখিনার মা তার তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। সখিনার মা ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকার ভাসমান পতিতা। ১২ বছর বয়সী সখিনাও এখন একই পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। সারা দিন ভিক্ষা করে কত টাকা পায় তা করিমন বিবি নিজেও জানে না। চোখে দেখে না। পচাবাসি যাই হোক, অন্তত তিন বেলা খেতে পায় এটাই তার সান্ত্বনা।

মর্জিনার বয়স ৮ কি ৯ বছর। হাইকোর্ট মাজারের সামনে উলঙ্গ শিশু তারেককে নিয়ে প্রত্যেক গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। পরিচয় জানতে চাইলে প্রথমে সরে গেল। ১০ টাকা ভিক্ষা দিতেই গর গর করে বলে গেল সব কথা। ছোট ভাই তারেক মায়ের পেটে থাকতেই বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। তখন মর্জিনা ভিক্ষা করে সংসার চালাতো। এখন ভাই তারেককে নিয়ে সিগন্যালে গাড়ির সামনে দাঁড়ালে অনেকেই ভিক্ষা দেয়। মা কোথায় যায়, কি করে কিছুই জানে না। তবে মাঝে মাঝে এসে টাকা নিয়ে যায় আর তারেককে দুধ খাইয়ে যায়। দেশ নোয়াখালী, বাবার নাম গিয়াসউদ্দিন। এর বাইরে কিছুই জানাতে পারলো না। মর্জিনার আয় প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। সে থাকে হাইকোর্ট মাজার সংলগ্ন খুপড়িতে। ভিক্ষার টাকার একটা অংশ প্রতিদিন দিতে হয় মাজারের রহিমকে, না হলে রাস্তায় বা মাজারের সামনে ভিক্ষা করা যাবে না। এই রহিম প্রতিদিন ভিক্ষুকদের কাছে চাঁদা বাবদ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পেয়ে থাকে। টাকার একটি অংশ ডিউটিরত পুলিশ কনস্টেবলকে দিতে হয় বলে জানাল সে প্রতিবেদককে।

অবশ্য প্রথম অবস্থায় চাঁদা দেয়ার কথা অস্বীকার করে সে। পরে নিজেই বলতে থাকে যে, পুলিশকে উৎকোচ না দিলে ফুটপাতে পিঠা বিক্রি করতে দেয় না। খুপড়ি বানিয়ে বাস করতে দেয় না। সবচেয়ে বড় কথা ভিক্ষা করতেই দেবে না।'

পুলিশ-সন্ত্রাসীর নেটওয়ার্ক

ভিক্ষুকরা বসবাসের ক্ষেত্রে দুটি দিক বেছে নিয়েছে। অস্বচ্ছল এবং কম আয়ের ভিক্ষুক সাধারণত বস্তিতে বসবাস করে। স্বচ্ছল বেশি আয়ের ভিক্ষুকরা টিনশেড বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘবদ্ধ গ্রুপ সাধারণত রিকশা এবং সিএনজি করে নিয়ে যায়। বিকালে এবং সন্ধ্যায় হেঁটে বা রিকশায় করে ফেরত আসে।

ঢাকা শহরের সবচেয়ে বেশি আয়ের ভিক্ষুকের বিচরণ ফার্মগেট ওভারব্রিজ এবং তদসংলগ্ন এলাকায়। ফার্মগেটের পুরাতন ওভার ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এক পা কাটা বিশালদেহী মানুষটি শহরের ভিক্ষুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করে। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। এক পা কাটা, চোখ-মুখ বাঁধা ভিক্ষুকের অদূরেই দাঁড়িয়ে

ভিক্ষার নতুন উপকরণ

উলঙ্গ শিশু

বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন ভিআইপি রোডে নতুন করে শুরু হয়েছে উলঙ্গ শিশু নিয়ে ভিক্ষা চর্চা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২ মাস থেকে ৬ মাস বয়সী কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছর বয়সী শিশুদের এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিক্ষার উপকরণ হিসেবে যে সব শিশুদের ব্যবহার করা হয়, তাদের অধিকাংশ ভাড়ায় নিয়ে আসা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশু এবং মা উভয়কেই ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। মাঘের এ তীব্র শীতেও এসব বাচ্চাদের শরীরে কোনো কাপড় থাকে না। ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহৃত এসব শিশুদের অধিকাংশের নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলেও একশ্রেণীর সংঘবদ্ধ গ্রুপ এদের ব্যবহার করে আসছে। রাজধানীর দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট মাজার, সচিবালয় প্রবেশদ্বারে এ ধরনের ভিক্ষা চর্চা বেশি চোখে পড়ে। এছাড়া নয়াপল্টন, মালিবাগ, মগবাজার, হোটেল সোনারগাঁও, শুক্রাবাদ, নিউমার্কেট, কলাবাগান এলাকায় এ ধরনের ভিক্ষুকদের পদচারণা বেশি দেখা যায়। মূলত ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে পড়া ভিআইপি যাত্রীদের কাছ থেকে এরা ভিক্ষা নেয়। উলঙ্গ শিশুদের সংঘবদ্ধ গ্রুপের নেতা মতিউর রহমান। এক সময় জাতীয় শিশু পার্কের সামনে বাদাম বিক্রি করতো। সেখান থেকে জড়িয়ে পড়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকার গাজাখোরদের সঙ্গে। এক সময় উদ্যানে ভাসমান পতিতাদের নেতা বনে যায়। এই পতিতা এবং ভাসমান লোকের সন্তানদের নিয়ে গড়ে তুলেছে উলঙ্গ শিশু ভিক্ষুক নেটওয়ার্ক।

লাশ নিয়ে ভিক্ষা

রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে লাশ নিয়ে ভিক্ষা করার জঘন্য কাজটি হচ্ছে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে। ঢাকার যেসব এলাকায় মানুষের পদচারণা সবচেয়ে বেশি, সেখানেই ভিক্ষাবৃত্তির এই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। তেজগাঁও থানার ফার্মগেট ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকা, উত্তরা থানার আজমপুর বাসস্ট্যান্ড ও ওভারব্রিজ, গাবতলী বাস টার্মিনাল এবং নিউমার্কেট এলাকায় লাশ নিয়ে ভিক্ষা চর্চা করতে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃতকে ভাড়া করে নিয়ে আসে, আবার অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত সাজিয়ে ভিক্ষা করা হয়। লাশ নিয়ে ভিক্ষা করার সময় লাশ দেখিয়ে দাফন করার জন্য সাহায্য চাওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাশের সারা শরীরে কাপড় আবৃত করে পাশে বয়স্ক মহিলা কোরআন শরিফ পড়তে থাকে। এতে করে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এবং লাশ দাফনের জন্য বেশি পরিমাণ সাহায্য মিলে। লাশ নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয় তেজগাঁও থানার শাহীনবাগ বস্তি, নাখালপাড়া বস্তি এবং হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের পেছনের বস্তির লোকজন জড়িত। এর মধ্যে হলি ফ্যামিলির পেছনের বস্তির পুরো অংশটাই ভিক্ষুক দ্বারা পরিচালিত। এই বস্তির সব সদস্য ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। বস্তির লোকজন মারা গেলে দাফনের জন্য লাশ সাজিয়ে ভিক্ষা করা হয়।

মাজারভিত্তিক মৌসুমি ভিক্ষুক

রাজধানী গোলাপশাহ মাজার, হাইকোর্ট মাজার, মগবাজার আমবাগান মাজার, পীর ইয়েমেনী মাজার, শাহ আলী বোগদাদী মাজার, কেন্দ্রীয় কারাগার মাজার, জটালী মার মাজারসহ অন্যান্য মাজারে প্রতিদিন কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষা করে। এছাড়া ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী, লাইলাতুল কদর, শবে-বরাত ও অন্যান্য ধর্মীয় দিনে ঢাকার বাইরে থেকে ভিক্ষুক এনে এসব জায়গায় ভিক্ষা করানো হয়। একটি সংঘবদ্ধ গ্রুপ দেশের দূরদূরান্ত থেকে চুক্তি করে ভিক্ষুকদের নিয়ে আসে। আয়ের ওপর নির্ভর করে এসব ভিক্ষুককে পারিশ্রমিক। মাজারভিত্তিক মৌসুমি ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণ করে সংশ্লিষ্ট মাজারের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের আশীর্বাদপুষ্ট লোকজন। সাধারণত ফেনসিডিল আসক্ত ব্যক্তির অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ কাজ করে থাকে। হাইকোর্ট মাজারে তারেক রহমান ওরফে তারেক্কা, শাহ আলী মাজারে সিয়াম আলী, মগবাজারে কানা মামুন, পীর ইয়েমেনী মাজারে নাটা বাবু, কেন্দ্রীয় কারাগার মাজারে মিয়াজ আলী জড়িত রয়েছে।

থাকে ভিক্ষুকের রক্ষণাবেক্ষণকারীরা। সকাল সাড়ে ৭টায় এসে নামিয়ে দেয়া হয়। দুপুরে আহারের সময় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া এ ব্রিজের ওপর মুখ ঢাকা মধ্যবয়সী মহিলা কোরআন শরিফ খুলে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। পড়তে না পারলেও হরফে চোখ বুলিয়ে যায়, পাশেই দুচোখ অন্ধ আরেক ভিক্ষুক ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দু'হাতের তালুর ওপর কয়েন দিয়ে বাজনা বাজায় আর বলে, 'আল্লা দে, আল্লা দে।' ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের লাগোয়া ওভারব্রিজের ওপর পলিথিনের খুপরি ঘর তুলে বসে থাকে অশীতিপর বৃদ্ধা। দেখলে মনে হয় আজই হয়তো প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে দেহ ছেড়ে। কিন্তুপ্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় না আর বৃদ্ধার ভিক্ষা করা ছাড়াও কোনো উপায়ও থাকে না। হলিক্রস স্কুল ও বটমলি হোমস স্কুলের সামনে অন্ধ ভিক্ষুক রহিম উদ্দিন অবিরত বলে যাচ্ছে, 'জানের ছদগা মালের ছদগা কইরা যাবেন দান ওগো, মুশকিলে পড়িলে গো আল্লাহ আছান করবে তোমাগো।' প্রতিদিন একই রাস্তায় একই সময়ে হাতে সিলভারের বাটি নিয়ে ভিক্ষা করছে এই ভিক্ষুক। ফার্মগেটের ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণকারী গডফাদারের নাম রিয়াজ উদ্দিন। বরিশালের আগৈলঝড়া থানার বাসিন্দা রিয়াজ উদ্দিন এক সময় আনন্দ সিনেমা হলের সামনে ফল বিক্রি করতো। এ সময় স্থানীয় মাস্তানদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। তাদের হাত ধরে প্রবেশ করে অপরাধ জগতে। পরবর্তীতে ভিক্ষুক নিয়ে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে থানা পুলিশের লিঁয়াজো করে ভিক্ষুকদের নিয়ে করে যাচ্ছে জমজমাট ব্যবসা।

আজমপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ভিক্ষা করে রহিমা বেগম ও আফসার উদ্দিন। তাদের আয়ের ১০ টাকায় ৬ টাকা নিজেরা ভোগ করে বাকি ৪ টাকা দেয় ফুটপাত নিয়ন্ত্রণকারী মিজানকে। মিজান এক সময় ফুটপাতে পিঠা বিক্রি করতো। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয়তাবাদী ইমারত নির্মাণ শ্রমিক দলে যোগ দেয়। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের যোগসাজশে ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করে জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

তেজগাঁও রেল স্টেশনের ভিক্ষুকদের কাছ থেকে বখরা নেয় রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা। এক সময় জমজমাট ফেনসিডিল, হেরোইন ভিক্ষুকদের মাধ্যমে পাচার করলেও বর্তমানে তা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রেলওয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ইউনিয়ন নেতা এবং দায়িত্বরত শ্রমিকরা ভিক্ষুকদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়ার কথা সরাসরি অস্বীকার করেন। নাম প্রকাশ না করে একজন শ্রমিক নেতা বলেন, 'মানবিক কারণে অসহায় মানুষ এখানে ভিক্ষা করে। তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

দেশের সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন কমলাপুরে বিচিত্র শ্রেণীর ভিক্ষুকদের মেলা বসে। রেলযাত্রীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করাই ভিক্ষুকদের মূল উদ্দেশ্য। তবে ভিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি অনেকেই অপরাধীদের বিশ্বস্ত সোর্স হিসেবে কাজ করে। রেলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনেকেই ভিক্ষুকদের মাধ্যমে নানা সংবাদ নিয়ে থাকে। আইসিডিকে (ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো) ঘিরে যে অপরাধী চক্র কাজ করে তাদের বিশ্বস্ত চর হিসেবে অনেক ভিক্ষুক কাজ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানের মালামাল ট্রেনের মাধ্যমে বহন করা হয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম হতে কন্টেইনারে অবৈধ অস্ত্র এবং মালামাল আনা হয়। রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে ভিক্ষুকদের একটি অংশ এসব অপরাধীদের সহযোগিতা করে থাকে।

রাজধানীর জিয়া উদ্যান ও জাতীয় সংসদ সংলগ্ন এলাকায় বিচিত্র ভিক্ষুকদের আনাগোনা দেখা যায়। এদের অনেকেই ভাসমান পতিতাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল। বর্তমানে শরীর এবং বয়সের কারণে ভিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এখানকার ভিক্ষুক এবং ভাসমান পতিতাদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ আদায় করে মোহাম্মদপুরে হাত কাটা অপু। সে এক সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় যাদুঘর, শিশু পার্ক অপরদিকে বারডেম, শেরাটন হোটেল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষা করে। এখানে ফুটপাত নিয়ন্ত্রণকারী লাইনম্যান ও পুলিশ ভিক্ষুকদের কাছ থেকে বখরা নিয়ে থাকে। লাইনম্যান নবুয়ত আলী জাতীয়তাবাদী কোর্স ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

বিচিত্র ধরনের ভিক্ষুকদের ভিড় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে যাতায়াতকারী লোকজন এসব ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিয়ে থাকে। এখানে ঘাট নিয়ন্ত্রণকারী সর্দাররা ভিক্ষুকদের কাছ থেকে বখরা নেয়। ঘাটের বিচিত্র ধরনের ভিক্ষুকদের আয় বেশি থাকায় ঘাট নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি দলের লোকজন ও পুলিশ উভয়েই ভিক্ষুকদের আয়ের একটি অংশ পেয়ে থাকে। সরকারি ঘাট শ্রমিক দলের মতিয়ার ভিক্ষুকদের পরিচালনা করে।

মহাখালী বাস টার্মিনাল ও তদসংলগ্ন এলাকায় ভিক্ষুকদের বিচরণ তুলনামূলক কম। মহাখালী, তিব্বত, সাত রাস্তায় অনিয়মিত ভিক্ষুকদের দেখা যায়। পরিবহন শ্রমিক নেতাদের নামে কাজল ভিক্ষুকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে।

গাবতলী টার্মিনালে প্রচুর ভিক্ষুক ভিক্ষা করে। এখানে ভিক্ষুকদের পরিচালনা করে একটি শক্তিশালী গ্রুপ। এখানে বিচিত্র ধরনের ভিক্ষুকরা যাত্রীবাহী বাসের ভেতরে প্রবেশ করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখিয়ে ভিক্ষা করে থাকে। গাবতলী বাস শ্রমিক ইউনিয়নের খালেক ভিক্ষুকদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নিয়ে থাকে।

সিটি কলেজ মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় ভাসমান ভিক্ষুকরা ভিক্ষা করে থাকে। কেনাকাটায় ব্যস্ত লোকজন এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ এখানকার ভিক্ষুকদের মূল টার্গেট। তবে সবখানেই ভিক্ষুকদের আয়ের ভাগীদার পুলিশ বলে অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য : মতিঝিল থানার এসআই সৈয়দ সেলিম সাজ্জাদ লিটন ভিক্ষুকদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভিক্ষুক সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষ। এদের কাছে থেকে পুলিশ চাঁদাবাজি করে এটা সম্পূর্ণ অসত্য। বিষয়টি পুলিশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

বছরে আয় ৩০ কোটি টাকা

ভিক্ষাবৃত্তিতে ঢাকা শহরে বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকার আয় করে সংঘবদ্ধ ভিক্ষুকের দল। ঢাকার বিভিন্ন স্পটে প্রতিদিন ভিক্ষুকরা মাথাপিছু আয় করে ১০০ থেকে ৪৫০ টাকা। রাজধানীতে সংঘবদ্ধ ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার জন। ফার্মগেট এলাকায় ভিক্ষা করে ১৫ থেকে ২০ জন। এদের গড়ে প্রতিদিনের আয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। মাসিক আয় ৯ হাজার টাকা এবং বছরে আয় হয় ১ লাখ টাকার ওপরে। নিউমার্কেট এলাকায় একজন ভিক্ষুকের বছরে আয় প্রায় ৯০ হাজার টাকা। হাইকোর্ট মাজার এলাকায় একজন ভিক্ষুকের আয় ৭২ হাজার টাকা, আজমপুর এলাকায় ৬৩ হাজার টাকা, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ৫৪ হাজার টাকা।

এছাড়া গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, যাত্রাবাড়ী, সায়েদাবাদ, গাবতলী, মহাখালী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ মোড়, সিটি কলেজ মোড়, মতিঝিল, ইত্তেফাক মোড়সহ প্রায় ৫০টি স্পট রয়েছে। এদের গড় আয় ২০০ টাকা হলে বছরে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা আয় করে। এই টাকার প্রধান ভাগীদার ভিক্ষুক নেটওয়ার্ক গডফাদার ও পুলিশ। বাকি টাকা ভিক্ষুকরা পেয়ে থাকে।

পাটুরিয়া টু ঢাকা

দেশের আলোচিত ফেরিঘাট ছিল আরিচা। বর্তমানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সরিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাটুরিয়া ফেরিঘাট। পাটুরিয়া ফেরিঘাটের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য ভিক্ষুক ভিক্ষা করে। মজার ব্যাপার হলো, ঘাট এলাকার এই ভিক্ষুকদের মৌসুমভিত্তিক ভাড়া করে আনা হয় রাজধানী ঢাকায়। রাজধানীর শক্তিশালী ভিক্ষুক নেটওয়ার্কের কর্তাব্যক্তিরা বছরের বিশেষ দিনে এদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুক পায় শতকরা ৪০ টাকা। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া ফ্রি। এই ভিক্ষুকদের দিয়ে শবে-বরাত ও শবে-কদর রাতে এক ঈদের দিন সকালে বায়তুল মোকাররম, হাইকোর্ট মাজার, শাহ আলীর মাজারসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ভিক্ষা করানো হয়। ভাড়া করা এই ভিক্ষুকদের অদূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় নেটওয়ার্কের সদস্যরা। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব দায়িত্ব নিয়েই এই কর্মীরা ভিক্ষুকদের সহযোগিতা করে থাকে।

মাওয়া টু ঢাকা

মাওয়া ঘাটের অধিকাংশ ভিক্ষুক সপ্তাহের শুক্রবার ঢাকায় চলে আসে। যাতায়াতের জন্য এদের কোনো ভাড়ার প্রয়োজন হয় না। প্রতি শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদ, গুলশান-১-এর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর মসজিদ, হাইকোর্ট মাজার জামে মসজিদের সামনে যে ভিক্ষুকরা ভিক্ষা করে তার অধিকাংশ মাওয়া ঘাটের ভিক্ষুক। সারাদিন ভিক্ষালব্ধ আয়ের শতকরা ৬০ টাকা এরা পেয়ে থাকে। বাকি অর্থ পেয়ে থাকে ভিক্ষুক পরিচালনাকারী নেটওয়ার্কের সদস্যরা। মাওয়া ফেরিঘাট এলাকায় ভিক্ষুকদের পরিচালনা করে কুলি সর্দার এমারত হোসেন। এই কুলি সর্দার ঘাট এলাকায় বখরার বিনিময়ে অন্য ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করার সুযোগ করে দেয়।

ভবঘুরে কেন্দ্র : বখশিশে ছেড়ে দেয়া হয় ওদের

রাজধানীর ভাসমান ঠিকানাহীন মানুষগুলোকে মাঝে মাঝেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ভবঘুরে কেন্দ্রে। অসহায় ভিক্ষুকরাও এই পুলিশি ব্যবস্থার শিকার হয়। আবার ভিক্ষুকদের গডফাদার ঠিকই তাদের বের করে নিয়ে আসে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পর অসহায় ও নিরন্ন মানুষের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য প্রথম ভবঘুরে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য পৃথক ৩টি ভবঘুরে কেন্দ্র কোলকাতা থেকে চাঁদাপুরে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো গাজীপুরের পুবাইল ও কাশিমপুর, ঢাকার মিরপুর, মানিকগঞ্জের বেতিলা, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং ময়মনসিংহের ঢালায়।

পুরুষদের ময়মনসিংহের ঢালায়, ছেলেদের মানিকগঞ্জের বেতিলা ও ময়মনসিংহের ঢালায় এবং বাকি কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ও শিশুদের রাখা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি অথবা ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানো ভবঘুরে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। ভিক্ষুকদের এই আইনে গ্রেপ্তার করে যদি থাকা-খাওয়া ও তার স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনেকটা ত্বরান্বিত হতো। আসলে এই ভিক্ষুকদের ভবঘুরে কেন্দ্রে পুনর্বাসন না করে ভিক্ষুকদের গডফাদারদের কাছ থেকে বখশিশ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এতে করে ভবঘুরেদের মূল অংশ ভিক্ষুকদের জন্য তেমন কোনো উপযোগী হয়ে ওঠেনি। ফলে সরকারি উদ্যোগে যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়ে থাকে তা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সহায়-সম্বলহীন এই ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে বয়স্ক ভাতাদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এসব অসহায় মানুষের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পারে।

প্রয়োজন : সামাজিক দায়বদ্ধতা

শিক্ষা সভ্যতায় আমরা যতোটা প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছি ঠিক ততটাই প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ছে আমাদের সনাতন সামাজিক অবকাঠামো। এক সময় সমাজ ব্যবস্থায় দাদা-দাদী, নানা-নানীদের বৃদ্ধ বয়সে অসহায় অবস্থায় নাতি-নাতনিরা দেখাশোনা করতো। বর্তমানে কাজের চাপে আধুনিকীকরণের তোড়ে সেই সুযোগ অনেকটা কম। আবার আমাদের দেশে বৃদ্ধদের পরিচর্যা করার জন্য কোনো ক্লিনিক বা আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। গ্রামীণ সমাজে অসহায় পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও ভিক্ষাবৃত্তির দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। সামাজিক বন্ধন একক পরিবারের যত দ্রুত ভেঙে পড়ছে তা থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো যথাযথ উদ্যোগ নেই। জীবনের শেষ বয়সে যে মানুষগুলো ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছে তারা রাজধানীতে সবাই নেটওয়ার্কের শিকার। সারা দিনের অর্জিত অর্থের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে যায় এ নেটওয়ার্কের সদস্যরা। সারা দিন পরিশ্রম শেষে এ অসহায় মানুষগুলোর উন্নত সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করা ও অভিশাপ দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। ভিক্ষুকদের অধিকাংশই এমন পরিবেশে ভিক্ষা করছে যার সংস্পর্শে এলে নগর জীবনের বিপরীত চিত্রটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পারিপার্শ্বিক দিক থেকে এরা যা পেয়ে থাকে তা কেবল তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গতকাল যে পরিবারটি পৈতৃক ভিটায় সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করতো আজ তারা পথের মানুষ। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এ মানুষগুলোর বেঁচে থাকতে হয় অন্যের দয়ায়। রাজধানীর এই ভিক্ষুক, ঠিকানাবিহীন এই মানুষগুলো কি এ সমাজের বাসিন্দা নয়? ভিক্ষাবৃত্তিতে আসার পেছনে কারা দায়ী তা খুঁজে বের করে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটু**

‘ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিত্তবান মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন’

প্রফেসর মাসুদা মনসুর রশীদ চৌধুরী
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : সম্প্রতি ঢাকা শহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এর পেছনে সামাজিক কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী : ভিক্ষাবৃত্তি পেশা মানুষ বেছে নেয়ার মূল কারণ দারিদ্র্য। বন্যা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ সবকিছু হারিয়ে কাজের আশায় গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসছে। কাজ না পেয়ে সহজতম আয়ের পথ ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিচ্ছে। এর ভেতর কেউ স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে ভিক্ষা করছে, কেউ অসহায় হয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। এতিম, ভবঘুরে, অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠ ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই ভিক্ষা করছে। এর বাইরে কিছু লোক এবং এনজিও এই পেশাকেই ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

২০০০ : ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র বা সরকারের কি দায়িত্ব রয়েছে?

মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী : ভাসমান অসহায় ভিক্ষুকরা এই শহরেরই মানুষ। ছিন্নমূল এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সরকার ভিক্ষুকদের জন্য আলাদাভাবে ভিক্ষুক আশ্রয় কেন্দ্র খুলে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। এই ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাঁশ-বেতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো সহযোগিতা করতে পারে। সরকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিত্তবান মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।